আলোর দরজা

বিমল গঙ্গোপাধ্যায়

— দেখি দেখি, আমার হাতে দাও।

— বিশ্বাস হচ্ছে না?

— কেমন অ্যাবসার্ড মনে হচ্ছে।

— অহেতুক মিথ্যে বলে, আমার লাভ কি?

— তুমি সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছ। আমি আমার ধারণার কথা বলছি।

কৃশানু তার জামার পকেটে হাত ঢোকাতে যাবে, হাসি তার হাতটা চেপে ধরল, থাক। দেখাতে হবে না।

হাসি নামের সার্থকতা, বোধহয় তার বাবা মা-ই একমাত্র জানেন।

কৃশানু প্রায়ই ভাবে, হাসির বাবা মা নিশ্চয়ই তাঁদের প্রিয় সন্তানের নামকরণের যথার্থতা নিয়ে, নিজেদের অদূরদর্শিতার দায়ভার একে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে ঝগড়া করেন।

হাসিকে কৃশানু কদাচিৎ হাসতে দেখেছে।

কাঁদতে দেখেনি একদিনও।

সব সময়েই সে তার চোখমুখে এক ধরণের কাঠিন্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। যেন এলেবেলে বিষয় নিয়ে, অতি প্রিয়জনও তার সঙ্গে আলোচনার সাহস না পায়।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে কৃশানু অনেকক্ষণ কোন কথা না বললেও, হাসি অস্থির হয়ে পড়ে না। বরং কখনও কখনও, কৃশানুর কোন কথার উত্তর, একটি বাক্যের পরিবর্তে, দুটি বা তিনটি বাক্যের মধ্যে দিয়ে দেওয়াটিকে, হাসি তার নিজস্ব স্টাইল বলে মনে করে।

যেমন, হাসি 'থাক, দেখাতে হবে না' বলার পরেও কৃশানু জামার পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটি টিকিট বার করে আনল।

— না দেখানোর কি আছে? তুমি অহেতুক ভুল বুঝছ।

— মনে করে দেখ! সামান্য থেমে, একটু আগে আমি তোমায় বলেছি। অল্প হেসে ঘাড় দুলিয়ে, দেখাতে হবে না।

শেষের অংশটুকু বলার সময়ে, দু চোখ আল্তো বন্ধ করে অদ্ভুত নিস্পৃহ ভাব ফুটিয়ে তুলল হাসি, তার চোখমুখে।

কৃশানু নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করল, দেখার ইচ্ছেটা তুমিই প্রকাশ করেছিলে।

— এখন ইচ্ছেটা চলে গেছে।

কৃশানু হেসে ফেলল। সময় বিশেষে হাসিকে যেমন তার দুর্বোধ্য মনে হয়, আবার কখনও কখনও ছেলেমানুষের মতোও লাগে।

এইসব মুহূর্তগুলির ঘ্রাণ অনেকক্ষণ ছড়িয়ে থাকে বাতাসে।

ওরা দুজন গল্প করছিল, হাসিদের বাড়ির তিনতলার ঘরে বসে। এই ঘরটি হাসির নিজস্ব।

মধ্যবিত্ত পরিবারে কোন ছেলে বা মেয়ের সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি ঘর থাকতে পারে, যে ঘরের আসবাবপত্র শুধু সেই ব্যবহার করে, ঘরটির সাজসজ্জা কেবল তারই রুচি অনুসারে, এটা একটা অকল্পনীয় ব্যাপার।

অন্তত কৃশানুর তাই মনে হয়।

আর শুধু এই কারণেই, প্রায়শই হাসির জায়গায় নিজেকে বসিয়ে কৃশানু অদ্ভুত তৃপ্তি পায়।

সে ধরে নেয়, এই ঘরটিতে সে যা খুশি তাই করতে পারে। যেখানে সেখানে সিগারেটের ছাই ফেলতে পারে। জানলা দরজা খুলে দিতে পারে হুটপাট করে। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় চিরুনি ঘষতে পারে। বিছানার চাদর টেনে নামিয়ে দিতে পারে। আরও কত কি করতে পারে। কেউ তাকে কিছু বলবে না।

কৃশানু তার হাতে ধরে রাখা টিকিটটি হাসির দিকে বাড়িয়ে ধরল, দেখ না, কি সব লেখা রয়েছে।

— বললাম তো! হাসি ঘাড় নাড়ল, ইচ্ছেটা চলে গেছে।

— আচ্ছা ঠিক আছে। কৃশানু হাত গুটিয়ে নিল। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, কি লেখা আছে শোন। ইউ আর জুডিশাস। রিলায়েবল অ্যান্ড পপুলার। আপ বিচক্ষণ। বিশস্ত। তথা লোকপ্রিয় হ্যায়।

হাসি বসেছিল খাটের ওপর। দুপা গুটিয়ে। হাঁটুতে আস্তো মুখ রেখে।

কৃশানুর পড়াটুকু শেষ হওয়া মাত্র সে সোজা হয়ে বসল। প্রয়োজনীয় কিছু খুঁজছে, এইরকম ভঙ্গিতে এদিক ওদিক তাকাল। হাতের চুড়ি ঠেলে তুলল ওপর দিকে।

এ সবই খাট থেকে নামার প্রস্তুতি।

কৃশানু হেসে বলল, কি হল? এত ভাল ভাল কথা পছন্দ হল না?

— পছন্দ অপছন্দের কি আছে? বিছানার চাদর ঠিক করতে করতে হাসি বলল, মনে ধরার মতো বিশেষণই! একটু থেমে, যদ্দূর জানি, লেখা থাকে এই ধরণের টিকিটে।

কৃশানু সামান্যক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর হেসে বলল, বিশেষণগুলির কি একটিও আমায় মানায় না?

— আমার ঠিক উল্টোটা মনে হল। অল্প একটু চুপ করে থেকে হাসি বলল, মনে হল, মাত্র এই কটি বিশেষণ! সংখ্যায় বড়ই কম।

কৃশানু হাসির কথার জবাব দিল না। মেঝে থেকে সিগারেটের প্যাকেটটি তুলে নিয়ে তার কাঁধ ব্যাগের মধ্যে রাখল।

আর ছোট টিকিটটি দু টুকরো করে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে দিল।

হাসি যেন এসব দেখেও দেখল না। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করতে করতে বলল,

— জুডিশাস শব্দটির অর্থ তো দূরদর্শী?

— তাই তো জানি। কৃশানু সংক্ষিপ্ত জবাব দিল।

— রিলায়েবেল? মানে বিশ্বস্ত? নির্ভরযোগ্য?

— তা হবে।

আয়নার মধ্যে দিয়ে কৃশানুকে দেখতে পাচ্ছিল হাসি। তবু সে আয়না থেকে মুখ ঘুরিয়ে, সরাসরি কৃশানুর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল, অ্যান্ড পপুলার ইজ ভেরি মাচ পপুলার। নট টু বি আস্কড্।

কৃশানু ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। কাঁধ ব্যাগটি তুলে নিয়েছে।

হাসি খুব অবাক হয়ে গেল, তুমি চলে যাচ্ছ?

— হ্যাঁ। কাজ আছে।

— হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

— আচমকাই।

ভুল হয়ে গেলে বা কোন কারণে আক্ষেপ হলে, মানুষ যেভাবে মাথা দোলায় এবং তার সঙ্গে শ্বাস ফেলে শব্দ করে, হাসিও সেইরকম করল।

আস্তে আস্তে জানলার কাছে সরে গেল। বাইরের দিকে চেয়ে ভিতরের মানুষটিকে উদ্দেশ্য করে বলল,

বিশেষ্যই ভাল। বিশেষণ বড় গোলমেলে।

কৃশানু যেন শুনতেই পেল না হাসির কথা। অথচ ম্লানভাবে হাসল। তারপর ধীর পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

নীচে কৃশানুর গলা শুনতে পাচ্ছে হাসি। প্রতুলকাকার সঙ্গে গল্প করছে।

প্রতুলকাকাকে মোটেও সহ্য করতে পারেন না হাসির মা। লোকটি অভাবী। আর তাই হাসির বাবার স্বচ্ছলতায় পরশ্রীকাতর।

হাসির মা প্রায়ই বলেন হাসিকে, তোর কাকা কেমন আরেঠারে তাকায় দেখবি। ঘরদোর জিনিসপত্রের দিকে।

হাসি যদিও এসব লক্ষ্য করেনি। তবু মায়ের অনুশাসনে সে'ও প্রতুলকাকাকে অগ্রাহ্য করে।

মায়ের মতো তারও মনে হয়, ছোট ভাইটির প্রতি তার বাবার বেশ দুর্বলতা আছে।

আর এটা জানে, বোঝে বলেই, তার কাকা এ বাড়িতে আসে। আসার সাহস পায়।

এসব কথা তো কৃশানুর অজানা নয়। তবু কেন সে অমন বেপরোয়ার মতো আচরণ করছে, মায়ের সামনে?

কৃশানু কি এ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক মুছে দিতে চাইছে?

আর তাই তাদের অপছন্দের মানুষটি যেন তার কত আপনার, কত কাছের, এটা বুঝিয়ে দিতেই গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে গল্প করছে? হা হা করে হাসছে।

হাসি নিঃশব্দে নীচে নেমে এল। ডাইনিং-এ মুখোমুখি দুটি চেয়ারে বসে গল্প করছে কৃশানু আর প্রতুলকাকা।

হাসিকে দেখে আচমকা দুজনেই চুপ করে গেল। কাজের মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল ঘরের দরজায়। ভিতরে ঢুকে গেল।

পরিবেশটি হঠাৎ থমথমে হয়ে গেল।

হাসি এদিক ওদিক তাকিয়ে তার মাকে দেখতে পেল না।

নিস্পৃহ গলায় বলল, কি হল? সব চুপ করে গেলে।

প্রতুলকাকা নিজের পাশের চেয়ারটি দেখিয়ে হাসিকে ডাকলেন, আয় না। এখানে বস।

হাসি বসল।

— ভাল করে আলাপ হল, বুঝলি! একদিন যাবে বলছে, আমার বাড়িতে।

হাসি লক্ষ্য করল প্রতুলকাকার কথাগুলি জড়িয়ে যাচ্ছে আনন্দে উচ্ছ্বাসে, তুই-ও আয় না। দুজনে একসঙ্গে আয়। বাড়ির সবাই খুব খুশি হবে।

'দুজনে' শব্দটি উচ্চারিত হওয়া মাত্র কৃশানু এবং হাসি পরস্পরের মুখের দিকে চাইল। কেউ কোন কথা বলল না।

কৃশানু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, চলি।

— আমিও যাব।

— আসুন। বলে কৃশানু তার হাতটি প্রতুলকাকার দিকে বাড়িয়ে ধরল। যেন চেয়ার টেবিল, টেবিলের ওপর শৌখিন অ্যাসট্রে, কারুকাজ করা ফুলদানি, পোর্টেবল ইমারজেন্সি আলো, এসবের ঘেরাটোপ থেকে মানুষটিকে সাবধানে বার করে আনতে চাইল।

হাসি অবাক হয়ে দেখল, অন্যদিনের মতো কৃশানু কাজের মেয়েটিকে ডাকল না। নিজেই কোলাপসেবল গেটটি খুলে, তার সাইকেলটি গেটের বাইরে বার করল।

হাসি টিকিটের ছেঁড়া দুটি টুকরো কৃশানুর দিকে বাড়িয়ে ধরল, ফেলে যাচ্ছ।

কৃশানু হাসল, আর দরকার নেই।

দুটি মানুষ এবং একটি সাইকেল, তিনটি ছায়া বাগান পার হয়ে চলে যাচ্ছে।

মানুষ দুজন কথা বলছে।

হাসি বুঝতে পারছে। কিন্তু সে তাদের কথাবার্তার একটি শব্দও শুনতে পাচ্ছে না।

ক্লান্ত পায়ে হাসি সোফায় এসে বসল। মায়ের গা ঘেঁসে। টিকিটের টুকরো দুটি টেবিলের ওপর রাখল।

— ওটা কি? হাসির মা গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

— ওজন মাপার টিকিট। কৃশানুর।

হাসির মা সোফা ছেড়ে উঠে এলেন। কাগজের টুকরো দুটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। ওপর নীচ করে লাগিয়ে টিকিটটিকে পূর্ণ অক্ষত করার চেষ্টা করলেন।

বিস্ময়ে তাঁর দু ভ্রু কুঁচকে গেল, ৭৮ কেজি? কৃশানুর ওজনটা যেন বড্ড বেশী। তাই না?

— জানি না। হাসি অস্ফুট জবাব দিল।

— নীচের লেখাটা পড়েছিস? বলতে বলতে হাসির মায়ের ঠোঁট বেঁকে গেল, জুডিশাস! রিলায়েবল! একটু থেমে বললেন, এগুলো কি ...!

— কৃশানুর বিশেষণ। এইটুকু বলেই হাসি তার মায়ের মুখের দিকে তাকাল, ওগুলো দাও।

— কি হবে, এই দু টুকরো কাগজ?

'কি হবে', হাসি কিছুতেই বলতে পারল না। অথচ তার কত কি বলার রয়েছে। আবার গলাও বুজে আসছে কান্নায়।

হাসির মা তাঁর মেয়েকে কোনদিন কাঁদতে দেখেননি। কান্না পেলে মেয়ের চোখমুখের অভিব্যক্তি কেমন হতে পারে, এ সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণাই নেই। তিনি অপলক মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

মায়ের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে হাসি কোনরকমে বলল,
বিশেষণগুলি কেমন অদ্ভুতভাবে ...!
মেয়ের কোন কথাই মায়ের বোধগম্য হচ্ছে না।
মেয়ের পিঠে আস্তো করে হাত ছোঁয়ানো মাত্র, মেয়ে মায়ের মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়াল।
কান্না ভেজা গলায় বলল,
বন্ধ দরজাটা কৃশানু কেমন হাট করে খুলে দিয়ে গেল, দেখ মা!